শরীয়তের দৃষ্টিতে
আমীর নির্ধারণ
ও
তাঁর আনুগত্যের গুরুত্ব
মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর ফারুক

শরীয়তের দৃষ্টিতে

আমীর নির্ধারণ

ও

তার আনুগত্যের গুরুত্ব

মাওলানা ঃ মুহাম্মাদ ওমর ফারুক

প্রকাশনায় ঃ

মাকতাবাতু সাইয়্যেদিশ শুহাদা

ঢাকা,বাংলাদেশ

অবতরণিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব ভূবনের অধিপতি মহান আল্লাহ্‌র জন্য। অসংখ্য দুরুদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

'জিহাদ' শরীয়তের একটি অকাট্য ফরয বিধান। যার ফযীলত, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যা আঁকড়ে ধরার ভেতর রয়েছে, দ্বীনও ইসলাম সুরক্ষার একমাত্র উপায়। মুসলিম জাতির নিরাপত্তা। দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতা। যা পরিত্যাগ করার ভেতর রয়েছে, দ্বীন ও দুনিয়ার অপদস্থতা। ইসলাম ও মুসলমানদের নিরাপত্তাহীনতা।

জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে– আমীর নির্ধারণের বিষয়টি। অনেকে এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে লিপ্ত। ভুল ধারণায় নিপতিত। আবার কেউ কেউ এটাকে বাহানা বানিয়ে মানুষকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখছে। তাই আমরা এ ব্যাপারে যথাসাধ্য দলীল ভিত্তিক আলোচনা করেছি। আসল বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

বিশেষ করে জিহাদের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে– আমীরের আনুগত্য। একজন মুজাহিদের জন্য আমীরের আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে আমীরের আনুগত্য না করা বা তাঁর কমাণ্ডে না চলা শুধু তার জন্য নয়; বরং পুরো কাফেলার জন্য বিরাট বিপর্যয়।

অবশেষে নেতৃত্বের গুনাবলী ও বৈশিষ্টাবলী সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক নির্দেশনা করা হয়েছে।

এই বই লিখার ক্ষেত্রে যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা করেছেন তিনি হলেন– তরুণ আলেম, বন্ধুবর মাওলানা মুফতী শহীদুল্লাহ্ সাহেব। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

আমরা বইটিকে সব ধরনের ভুল মুক্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। এতদ্বসত্ত্বেও এতে কোন ধরনের ভুল সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করে শুধরানোর সুযোগ করে দেয়ার অনুরোধ রইলো।

এই বই পড়ে কোন মুমিনের অন্তরে শরীয়তের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ওপর যত্নবান হওয়ার সামান্য স্পৃহা জাগলেই আমাদের শ্রমকে সার্থ্যক জ্ঞান করবো।

আল্লাহ্ তা'আলা এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। আমীন!

বিনয়াবনত

ওমর ফারুক

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

জিহাদের জন্য আমীর নিযুক্ত করণ

وعن ابی هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب
عليكم مع كل امير برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)-থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের ওপর যে কোন আমীরের অধীনে থেকে জিহাদ করা ফরয। চাই সে আমীর সৎ পরায়ণ হোক বা অসৎ পরায়ণ ও স্বৈরাচার হোক। যদিও সে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয়।

-আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড-১ পৃঃ ৩৪৩

রাসূলের এই হাদীসখানা হতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জিহাদের জন্য এমন একজন আমীর থাকা অপরিহার্য, যার অধীনে থেকে মুসলমানরা জিহাদ করবে। এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে ফলপ্রসূ পন্থা তো এটিই যে, বর্তমান খলীফা তথা রাষ্ট্রপ্রধান তাদের আমীর হবেন। তিনি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করবেন। তবেই সব গুলো বিষয় সঠিক ও সুচারুরূপে পরিচালিত হবে। সব ধরনের শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। সর্ব প্রকারের চাহিদা পূরণ হবে। যদি মুজাহিদরা সাময়িকভাবে শত্রুদের হাতে কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তবে তৎক্ষণাৎ কেন্দ্রের পক্ষ হতে নতুন বাহিনী পাঠিয়ে তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা থাকবে। যদি এই ব্যবস্থাপনা না থাকে, আর মুজাহিদরা পরাজয়ের শিকার হতে থাকে এবং পদে পদে তারা হোঁচট খেতে থাকে, তবে তাঁদের হিম্মত দুর্বল হয়ে যাবে। সাহসে ভাটা পড়বে। অথবা বড় বড় সেনাপতিরা শহীদ হয়ে যাবেন তখন অবশিষ্ট অপেক্ষাকৃত ছোটরা হিম্মত হারা হয়ে যাবে। জিহাদের পুরো নিযামে পরিবর্তন সৃষ্টি হবে। জিহাদ তার সঠিক লক্ষ পানে পৌঁছতে বাধার সম্মুখীন হবে। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

অতীতের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি বুলালে এই বিষয়টি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে যে, মজবুত প্রাণকেন্দ্র ও বলিষ্ঠ সহযোগিতার অভাবে জিহাদের ময়দানে বড় বড় কমাণ্ডারদের শাহাদাতের পর পুরো কাজ থেমে গেছে।

এ ক্ষেত্রে আমরা হযরত হুসাইন (রাযিঃ)-কে উদাহরণ স্বরূপ বুঝতে পারি। এমনিভাবে মনসুর আব্বাসীর বিরুদ্ধে ইবরাহীম ও তার ভাই মুহাম্মাদ নফ্‌সে জাকিয়্যা'র আন্দোলন আমাদের সামনে রয়েছে। সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর জিহাদ ও কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। শামেলীর ময়দানে উলামায়ে দেওবন্দ যেমন- হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাযিরে মাক্কী, মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানুতুভী ও হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গোঙ্গহী (রহঃ) এবং তাঁদের সাথীদের কর্ম-কীর্তি কারো দৃষ্টির আড়ালে নয়। তাদের ইখলাস ও একনিষ্ঠতার ব্যাপারে কেউ মুখ খুলতে পারবে না। আর একথা বলা যাবে না যে, তাঁরা তাঁদের মিশনে বিফলকাম হয়েছেন। তবে এটুকু অবশ্যই বলা যাবে যে, মজবুত প্রাণকেন্দ্র ও সর্ব স্বীকৃত খলীফা না থাকার দরুন তাদের এই আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে সামনে অগ্রসর হতে পারেনি। বরং এক পর্যায়ে এসে এ ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এমনিভাবে আধুনিক যুগের অকুতোভয় বীর মুজাহিদ শহীদ হাসানুল বান্না (রহঃ)-এর "ইখওয়ানুল মুসলিমীন" আন্দোলন ও ঐ একই রোগে আক্রান্ত হয়। সংগঠনটির ভীত এমন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের হাতে গড়া সত্ত্বেও আজ তা মৃত্যু শয্যাশায়ী। এ ধরনের আরো বহু উপমা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। আমরা সে দিকে আর যাচ্ছি না।

এ সমস্ত আন্দোলন দমে যাওয়ার ও এক পর্যায়ে থেমে যাওয়ার পেছনে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল কারণ একটাই যে, এ সবের পেছনে মজবুত কোন প্রাণকেন্দ্র ও সর্ব স্বীকৃত কোন খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের তদারকি ছিল না।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলামী জিহাদ ও সঠিক আন্দোলন সুচারুরূপে পরিচালিত ও ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকার

জন্য সর্ব স্বীকৃত খলীফা তথা রাষ্ট্রপ্রধান থাকা অপরিহার্য। যিনি হবেন মুজাহিদদের আমীর এবং তাঁর অধীনেই জিহাদ পরিচালিত হবে।

যদি দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম মুজাহিদদের সর্ব স্বীকৃত খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান না থাকে, তবে শরীয়তের আলোকে মুজাহিদরা নিজেদের মধ্য হতে একজনকে আমীর নিযুক্ত করে তাঁর অধীনে জিহাদ করতে থাকবে। যদিও এভাবে জিহাদের মূল লক্ষে পৌছার পথ দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে এবং অনেকটাই দুষ্করও হয়ে পড়বে। কিন্তু প্রথম নাম্বারের উত্তম পন্থার অবর্তমানে এই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে।

آزمودہ فتنہ ہے اك اور بھی گردوں کے پاس

سامنے تقدیر کے رسوائ تدبیر دیکھ

'কালের আবর্তনের হাতে পরিক্ষার আরেকটি কৌশল অবশিষ্ট রয়েছে,

ভাগ্য লিপির সম্মুখে মানব প্রচেষ্টার ব্যর্থতাও প্রত্যক্ষ কর।'

আর এ বিষয়টি সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত। যার জন্য এখানে কয়েকটি দলীল পেশ করা হচ্ছে।

১. হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ বুখারী শরীফে একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন, যার শিরোনাম তিনি এভাবে দিয়েছেনঃ

باب من تأمر فى الحرب من غيرإمرة اذا خاف العدو

(অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুশমনের আক্রমণের আশংকায় বর্তমান খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ ও তার নিযুক্তি ব্যতিরেকে যুদ্ধের ময়দানে আমীর হয়ে যায়)

অতঃপর তিনি এর স্বপক্ষে মু'তার যুদ্ধের ঘটনাটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন যে, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ বিন হারেসা, হযরত যাফর তাইয়্যার ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ)-কে পরপর আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের শাহাদাতের পর হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রাযিঃ) উপস্থিত মুজাহিদগণের পরামর্শক্রমে

নিজে আমীর হয়ে ছিলেন। কারণ, দুশমনের মুকাবিলার প্রয়োজন ছিল। আর আমীর বানানোর জন্য মদীনায় রাসূলের নিকট যাওয়া সম্ভব ছিল না।'

বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'তে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন ঃ এভাবে আমীর নির্ধারণ করা জায়েয আছে। যেমন, ইবনে মুনীর (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, এ হাদীস থেকে এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, যখন (মুজাহিদদের পরামর্শক্রমে) আমীর নির্বাচিত হয়ে যাবে এবং বর্তমান খলীফা বা রাষ্টপ্রধানের অনুমতি পাওয়া কঠিন ও সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, তখন এই নির্বাচিত আমীরের আমীরত্ব শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হবে এবং সেই আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে। আর এখানে একথাটি তো স্পষ্ট যে, মুজাহিদরা এ সময় তাঁকে আমীর নিযুক্ত করেছে এবং তার আমীরত্বের ওপর ঐক্যমত পোষণ করেছে।'

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা একথা আর বুঝতে বাকী নেই যে, তৎকালীন সরকার প্রধানের পক্ষ থেকে আমীর নিযুক্ত করণের বিষয়টি যদি মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়, তখন মুজাহিদরা শলা-পরামর্শ করে নিজেদের মধ্যে হতে একজনকে আমীর নিযুক্ত করতে পারবে। আর শরঈভাবেও সেই আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে।

বর্তমান সরকার প্রধান না থাকার দু'টি দিক হতে পারে

* হয়ত একেবারেই কোন খলীফা থাকবে না, বরং মুসলমানরা খলীফাবিহীন থাকবে। যেমন, বর্তমানে কাশ্মীর ও এর পূর্বে ফিলিস্তিন ও তালেবান বিপ্লবের পূর্বে আফগানিস্তানের যে অবস্থা ছিলো। এ মতাবস্থায় মুজাহিদরা নিজেরাই নিজেদের আমীর নিযুক্ত করতে পারবে।

* খলীফা তো থাকবে, কিন্তু সে জিহাদ ও মুজাহিদদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না। তার নিকট জিহাদের কোন মূল্য নেই। শুধু তাই নয় বরং সে জিহাদী কার্যক্রম ও মুজাহিদদের নিধন করার অপেক্ষায় থাকে। এহেনাবস্থায়ও মুজাহিদরা নিজেরা নিজেদের আমীর নির্বাচিত করে নিতে পারবে এবং তখন এটাই তাদের আবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে।

২. হযরত আবু বছীর (রাযিঃ) সমুদ্র উপকূলে সেনা ক্যাম্প খুলে মুজাহিদদের আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর অধীনে বহু যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। হযরত আবু বছীর (রাযিঃ)-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীর বানাননি বরং মুজাহিদরা নিজেরাই তাঁকে আমীর নির্বাচিত করেছিলো। আর রাসূল (সাঃ) তাঁদের এ কাজের প্রতি অস্বীকৃতি প্রকাশ করেননি।

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) তৎকালীন খলীফার বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। মুজাহিদরা তাঁকে নিজেদের আমীর নিযুক্ত করেছিলো। মক্কা, মদীনা ও হিযাযের কিছু এলাকায় তাঁর খিলাফতও কায়েম হয়েছিলো। আমরা তাঁর এ পদক্ষেপকে ভুল বলতে পারি না।

৪. হযরত হুসাইন (রাযিঃ) ইয়াযিদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচু করেছিলেন। অথচ মুজাহিদরাই তাঁকে আমীর নিযুক্ত করেছিলো। কোন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তিনি আমীর নির্বাচিত হননি। তাঁর এ জিহাদকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

৫. খলীফা মানসূর আব্বাসীর বিরুদ্ধে ইবরাহীম ও তাঁর ভাই মুহাম্মাদ নফ্সে জাকিয়্যা'র যে জিহাদী আন্দোলন গড়ে ওঠেছিলো এবং ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) যার সমর্থন করেছিলেন। এদেঁরকেও মুজাহিদরাই আমীর নির্বাচিত করে বড় বড় যুদ্ধ করেছে। যেটাকে আমরা না হক বলতে পারি না।

৬. আল্লামা ইবনে নুহাস (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'মাশারিউল আশওয়াক' এ লিখেন যে, এ কথাটি মনে রেখো, খলীফা কিংবা তার নায়েব ব্যতীত জিহাদ করা মাকরূহ, তবে হারাম নয়। কারণ, তাঁদের অনুমতি ব্যতিরেকে যুদ্ধ করা সর্বোচ্চ ধোঁকা বলা যেতে পারে। অথচ রণক্ষেত্রে দুশমনকে ধোঁকা দেয়া বৈধ।

শাইখুল ইসলাম আবু হাফ্স বলকানী (রহঃ) বলেন, কয়েকটি অবস্থা রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতির গণ্ডি বহির্ভূত।

* অনুমতি নিতে গেলে মুজাহিদদের লক্ষ-উদ্দেশ্য হাত ছাড়া হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি বা দল কোন ধরনের মাকরূহ ব্যতিরেকে জিহাদ জারী রাখতে পারবে।

* রাষ্ট্রপ্রধান জিহাদ পরিত্যাগ করেছে। শুধু তাই নয় বরং স্বয়ং বাদশা ও তার বাহিনী দুনিয়ার পেছনে পড়ে গেছে। যেমন-বর্তমান অবস্থা। এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি বা দল জিহাদ করে, তবে এতে কোন দোষ নেই। কারণ, তাঁরা একটি অবহেলিত ফরযকে জীবিত করছে।

* রাষ্ট্রপ্রধানের কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার কোন সুযোগ নেই, অথবা প্রবল ধারণা যে, রাষ্ট্র প্রধান বা বাদশা অনুমতি দিবে না। তখন তার অনুমতি ব্যতিরেকে মানুষ জিহাদ করতে পারবে।

আল্লামা ইবনে কুদামা (রহঃ) নিজ গ্রন্থ 'আল মুগনী'র ১০ নং খণ্ডের ৩৭৪ নং পৃষ্ঠায় লিখেন যে, যদি সর্বস্বীকৃত আমীর না পাওয়া যায়, তবে জিহাদ কে পিছিয়ে দেয়া হবে না। কারণ জিহাদকে পিছিয়ে দেয়ার দরুন সামরিক কৌশল ও সুযোগ-সুবিধা হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে।

এখানে এসে তিনি এটাও লিখেন যে, যদি সর্বস্বীকৃত আমীর বা খলীফা না পাওয়া যায়, তবে জিহাদকে পিছানো যাবে না। আর গণীমতের সম্পদ মুজাহিদরা শরীয়ত সম্মতভাবে বন্টন করে নিবে।

৭. বিতাড়িত ইংরেজদের মুকাবিলায় সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) ময়দানে নেমে এসেছিলেন। সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহঃ)-কে মুসলিম মুজাহিদদের সর্বস্বীকৃত আমীর নির্বাচিত করা হয়েছিলো। অতঃপর তাঁরা শিখদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ ও কঠিন যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। এ যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন। তিনি কি সঠিক আমীর ছিলেন না? এঁরা কি আমাদের জন্য আদর্শ নয়? অবশ্যই এঁরা আমাদের জন্য আদর্শ। এঁরা আমাদের পথ প্রদর্শক। এঁদের জিহাদ সঠিক ছিলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

৮. ১৮৫৭ সালে হিন্দুস্তানের আলেমগণ দিল্লীর জামে মসজিদে ইংরেজ লুটেরাদের বিরুদ্ধে জিহাদের সর্ব সম্মত ফতোয়া দিয়েছিলেন। এ ফতোয়ার ওপর পর্যালোচনা করার জন্য থানা ভবনে উলামায়ে কিরামের একটি মজলিসে শু'রা ডাকা হয়েছিলো।

আলোচ্য বিষয় ছিল, আমরা বর্তমান এ পরিস্থিতিতে জালিম ও লুটেরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারবো কি না? আর এহেন পরিস্থিতিতে আক্রমণাত্মক জিহাদের শরঈ বিধান কি?

মজলিসে উপস্থিত সবাই সর্ব সম্মতভাবে তাদের ফতোয়ার সমর্থন করলেন। হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুভী, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গোঙ্গহী ও হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাযিরে মাক্কী (রহ.)-এর ন্যায় ব্যক্তিত্বরাও এ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। শুধু মাত্র এক বুযুর্গ হযরত মাওলানা শায়েখ মুহাম্মাদ থানভী (রহ.)-এ ফতোয়ার ব্যাপারে অমত ছিলেন।

ঐ মজলিসে একটি চমৎকার বহছ হয়েছিল। পাঠকদের মনের সুপ্ত প্রশ্ন গুলোর জবাব দেয়ার জন্য তুলে ধরলাম।

মাওলানা কাসিম নানুতুভী (রহ.) অত্যন্ত আদবের সাথে বললেনঃ হযরত! কি কারণ যে, আপনি দ্বীন ও দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরয, শুধু তাই নয় বরং বৈধও মনে করেন না?

হযরত শায়েখ মুহাম্মাদ থানভী (রহ.)[১] ঃ এ জন্য যে, আমাদের কাছে হাতিয়ার নেই। জিহাদের অস্ত্র নেই। আমরা সরঞ্জামহীন।

হযরত নানুতুভী (রহ.) ঃ এই পরিমাণ সরঞ্জামাদীও কি নেই, যা বদর যুদ্ধে ছিলো?

শায়েখ মুহাম্মাদ ঃ যদি আপনার সকল দলীল-প্রমাণ ও সব কথা মেনে নেয়া হয়, তবুও জিহাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শর্ত আমীর নিযুক্ত করা। সে আমীর কোথায়, যার অধীনে থেকে জিহাদ করা হবে?

হযরত নানুতুভী ঃ আমীর নিযুক্ত করতে দেরী কোথায়? মুর্শিদে হক হযরত হাজী (ইমদাদুল্লাহ) সাহেব (রহ.) উপস্থিত রয়েছেন তার হাতে বায়াত করা হবে।

হযরত মাওলানা হাফিয যামেন শহীদ (রহ.) বললেন ঃ মাওলানা! ব্যস, বুঝে এসে গেছে।

অতঃপর সবাই হযরত হাজী সাহেবের হাতে বাই'য়াত গ্রহণ করলেন।

(উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী খন্ড ৪ পৃষ্ঠা ২৭৩)

টীকা,১....... ইনি হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) নন।

৯. জিহাদের জন্য সর্বসম্মত আমীর নিযুক্তির ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা ফযল মুহাম্মাদ সাহেব নিজ গ্রন্থ 'দাওয়াতে জিহাদ' এর ৬৯ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, আমীর নিযুক্তির আলোচনায় ইংরেজদের মতামত সম্পর্কে অবগতি লাভ করাও ফায়দা থেকে খালী নয়। কারণ, ইংরেজদেরও একটি ফতোয়া বিভাগ রয়েছে। যেখান থেকে তারা নিয়মিত ফতোয়া প্রদান করে এবং ইসলামের যেই বিধানের ক্ষেত্রে নিজেদের জন্য শংকা অনুভব করে, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তারা এর বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদান করে। অতঃপর অর্থ- কড়ি ও প্রচার-মিডিয়ার শক্তির মাধ্যমে সেটাকে ব্যাপক করে তোলে। এর মাধ্যমে সমস্ত মুসলামানদের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টিকরে দেয়। মুসলমানদেরকে অপ্রয়োজনীয় ও দূর-দূরান্তের খুঁটি-নাটি বিষয়ে জড়িয়ে রাখে। যেমন, ভারত উপমহাদেশে যখন মুসলমানরা আযাদী আন্দোলনে শামিল হতে শুরু করলো-যা পরে এসে আযাদীর লড়াইয়ের রূপ ধারণ করেছিলো-তখন বৃটিশ হুকুমত গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মাধ্যমে জিহাদের বিরুদ্ধে বিরাট কাজ নিয়েছে এবং স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খান প্রমুখকেও জিহাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। অতঃপর নিজেদের ফতোয়া বিভাগ থেকে ফতোয়া জারী করেছে যে, এটা জিহাদ নয়।

মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া সাহেব 'তাহরীকে শাইখুল হিন্দ (রহঃ) নামক বইয়ের ১১৮ নং পৃষ্ঠায় যা কিছু লিখেছেন, তার সারাংশ আমি তুলে ধরছি ইনশাআল্লাহ পাঠকবৃন্দ অনুমান করতে পারবেন যে, আমীর নিযুক্ত করা প্রসংগে ইংরেজরা কেমনভাবে আমাদেরকে গোলক ধাঁ ধাঁয় ফেলে দেয়।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) হাজী তিরঙ্গ জঈ সাহেবকে জানিয়ে দিলেন এবং আবশ্যকীয় করে দিলেন যে, তিনি যেন ইয়াগিস্তান (সীমান্ত প্রদেশের আযাদ কাবায়েল) এলাকায় চলে যান এবং অনতিবিলম্বে আক্রমণ শুরু করে দেন। নির্দেশ মাফিক হাজী সাহেব কাবায়েল এলাকায় গিয়ে পৌঁছলেন। মুজাহিদদের সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে গেল। কিছু দিনপর যুদ্ধ শুরু হলো এবং আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের অভাবনীয় সফলতা অর্জিত হতে লাগলো। ইংরেজ বাহিনী পিছ পা হয়ে নিজেদের ছাউনিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য

হলো। এই বিজয়ধারাকে থামিয়ে দিতে জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়।

* জন সাধারণের মধ্যে অপ-প্রচার করা হোক যে, এটা জিহাদ নয়। খলীফা ব্যতীত জিহাদ হয় না। খলীফা ছাড়া জিহাদ করা হারাম।

* পানির ন্যায় অর্থ ছিটানো হোক এবং নিজেদের লোকদেরকে কবিলার সর্দারদের নিকট পাঠিয়ে অজস্র টাকা-পয়সার মাধ্যমে হাজী সাহেবের মুজাহিদীনের দল থেকে লোকদের বের করে আনা হোক।

* জন সাধারণের মধ্যে এটা প্রচার করে দেয়া হোক যে, সীমান্তবর্তী মুসলমান ও আফগানীদের বাদশা 'আমীর হাবীবুল্লাহ' আফগানিস্তানের প্রধান। মুসলমানদের উচিত তার হাতে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করা এবং ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা, যতক্ষণ না সে জিহাদের ঝাণ্ডা বুলন্দ করে।

* এখন মুসলমানদের জন্য কর্তব্য হল যে, তারা কাগজের ওপর জিহাদের বাইয়াত করে দস্তখত করবে এবং এই বাইয়াতনামাটি কাবুলের নায়েবে সর্দার নুসরাতুল্লাহর দফতরে জমা দিবে।

* আমীর হাবীবুল্লাহ খানকে নানা ধরনের ওয়াদা-অঙ্গীকারের রঙ্গিন স্বপ্ন দেখিয়ে অঢেল সম্পদের মাধ্যমে জিহাদে দাঁড়াতে রুখতে হবে।

* ইংরেজদের সাথে তুর্কিদের যে যুদ্ধ চলছে, সেটার ব্যাপারে এ প্রোপাগান্ডা করা হোক যে, এটা জিহাদ বা ধর্মীয় যুদ্ধ নয়; বরং তা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-কলহ।

* সুলতান আবদুল মযীদ খান, যিনি তুর্কী খলীফা ছিলেন তাঁর পক্ষ থেকে ইংরেজরা একটি মিথ্যা ফরমান হাসিল করল এবং সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রচার করল যে, বাদশার এই ফরমান মানা সবার জন্য ফরয। সেই ফরমানটি ছিল এই যে, ইংরেজদের আনুগত্য করা জরুরী। তাদের সাথে লড়াই না করা উচিত।

দেখা গেল যে, এর দ্বারা মানুষের স্পৃহা-উদ্দীপনা থেমে গেল। আফগানিস্তানের গর্ভনর নিজ সংবিধানে লিখে যে, খলীফার এই ফরমানের ভিত্তিতে সীমান্তবর্তী কবিলা গুলো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলো।

১০. মাওলানা নূর মুহাম্মাদ সাহেব নিজ গ্রন্থ 'জিহাদে আফগানিস্তান'এর ১১৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেনঃ

আব্বাসীয়া যুগ পর্যন্ত অধীকাংশ যুদ্ধগুলো সর্বস্বীকৃত আমীর ও খলীফার অধীনে আক্রমণাত্মকভাবে পরিচালিত হয়েছে। যেহেতু ফিক্হী বিধান সম্বলিত গ্রন্থ ও অধিকাংশ ফতোয়া গ্রন্থসমূহ ঐ যুগেই লিখা হয়েছে। তাই ফিক্হের কিতাবসমূহে যেখানেই জিহাদের আলোচনা রয়েছে, সাথে সাথে সেখানে খলীফাতুল মুসলিমীন ও সর্বস্বীকৃত আমীরের কথা প্রকাশ্যে বা পরোক্ষভাবে উল্লেখ রয়েছে। তবে এটা শুধুমাত্র উপস্থিত ব্যবস্থাপনা হিসেবে হয়েছে। এটা কোন বিধিবদ্ধ শর্ত হিসেবে ছিলো না। এর দ্বারা কিছু কিছু লোক, শুধু তাই নয় বরং বিশেষ ব্যক্তিরাও সন্দেহে পড়ে গেছে যে, মনে হয় জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য খলীফাতুল মুসলিমীন ও সর্বস্বীকৃত আমীরের অনুমোদন অপরিহার্য। এতদ্ব্যতীত ইংরেজদের প্রতারণা ও তাদের ফতোয়া বিভাগ এটাকে আরো শক্তিশালী করে তুলল। নতুবা জিহাদ বৈধ ও সঠিক হওয়ার জন্য সর্ব স্বীকৃত আমীর থাকা ও তার পক্ষ থেকে অনুমোদনের আলোচনা ফিক্হের গ্রহণযোগ্য কোন কিতাবে আপনি পাবেন না। তবে মুজাহিদরা যখন যুদ্ধ করবে, তখন তাঁরা কাউকে আমীর বানিয়ে নিবে। অতঃপর জিহাদী প্রোগ্রাম শুরু করবে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ।

জিহাদের জন্য আমীর নিযুক্তির প্রসংগে আপনাদের খিদমতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম। যা থেকে আশা করি আপনারা অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, জিহাদের জন্য আমীর নিযুক্তির ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা হল এটিই যে, বর্তমান খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান যিনি থাকবেন, তিনিই হবেন জিহাদের আমীর। তার অধীনেই জিহাদ পরিচালিত হবে। যদি এ ধরনের খলীফা বা রাষ্ট্র প্রধান না থাকে বা খলীফা অথবা রাষ্ট্র প্রধানতো আছেন বটে; কিন্তু তার পক্ষ থেকে জিহাদের পৃষ্ঠপোষকতা বা অনুমোদন পাওয়া তো দূরের কথা, তিনি সর্বদা মুজাহিদের দমন ও নিধনে ব্যতি-ব্যস্ত থাকেন। যেমন, বর্তমান অবস্থা। তবে এমতাবস্থায় মুজাহিদরা শরীয়তের আলোকে পরামর্শক্রমে নিজেদের মধ্য হতে কাউকে আমীর নিযুক্ত করতে পারবে।

আপনারা এ বিষয়টিও হয়ত উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, বহু যুগ আগ থেকেই বৃটিশ-বেনিয়া, তথাকথিত বুদ্ধিজীবি ও এক শ্রেণীর নামধারী উলামা মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে ফেরানোর গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এরা সামান্য ও খুঁটি-নাটি বিষয়কে বিরাট কিছুর রূপ দিয়ে মানুষকে জিহাদ থেকে সরিয়ে রাখার পেছনে সকল শ্রম ব্যয় করে। ঐ সব ষড়যন্ত্রের একটি অংশ আমীর নিযুক্তির বিষয়টিও। তাই এদের ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং শরীয়তের আলোকে যা আমাদের জন্য কল্যাণকর সেটার ওপর আমল করে জিহাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

উল্লিখিত হাদীস টি থেকে একথা ও জানা গেছে যে, গোনাহগার মানুষও জিহাদে শরীক হয়ে নিজের গোনাহকে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারে। এমনটি নয় যে, আগে মা'সুম হতে হবে, আগে ফিরেশতা হয়ে যেতে হবে। তারপর জিহাদ।

দেখুন! এখানে বলা হয়েছে যে, আমীর যদি কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিও হয়, তবুও মুজাহিদদের তাকে মানতে হবে। যখন আমীর পাপে লিপ্ত থাকা অবস্থায় জিহাদের নেতৃত্ব দিতে পারে, তখন তার অধীনস্ত মামুররা তো আরো ভাল করে জিহাদ করতে পারবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, গোনাহের প্রতি দাওয়াত দেয়া হচ্ছে বা গোনাহ করলে কিছু আসে যায় না বরং বাস্তব অবস্থাকে তুলে ধরা যে, গোনাহের অজুহাত দেখিয়ে জিহাদ থেকে দূরে থাকার কোন সুযোগ নেই। আজ অনেকে এসব দাবী উত্থাপন করে যে, মুজাহিদদের মধ্যে অমুক অমুক দোষ-ত্রুটি রয়েছে, অমুক মুজাহিদ অমুক পাপ কাজে লিপ্ত। বাস্তবেই যদি তাদের মধ্যে ঐ দোষ থেকে থাকে, তবে অবশ্যই তা সংশোধন যোগ্য। আর তারা যে, সব ধরনের দোষ-ত্রুটি মুক্ত পূত-পবিত্র হবেন এমনটিও নয়। তাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকতে পারে কিন্তু এ ক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তির পাপের দরুন একটি ফরয বিধানকে দোষারোপ করা যায় না। কোন ব্যক্তির পাপের শাস্তি জিহাদের ঘাড়ে চাপানো কোন বুদ্ধি মানের কাজ হতে পারে না। কারো দুর্বলতার অজুহাত সামনে দাঁড় করিয়ে নিজেকে জিহাদ থেকে দূরে রাখার কোন সুযোগ নেই।

আর এটা দুশমনদের বিরাট চাল যে, আগে ফেরেশতা হতে হবে, আগে মা'সুম হতে হবে, তারা পর জিহাদ করা যাবে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) নিজ গ্রন্থ বুখারী শরীফে একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন 'باب عمل صالح قبل القتال' অর্থাৎ, 'জিহাদ করার পূর্বে কোন নেক আমল করা।'

এ অধ্যায়ে তিনি এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল- হুযূর! আমি কি আগে লড়াই করবো, না কি ইসলাম গ্রহণ করবো? রাসূল বললেন, আগে ইসলাম গ্রহণ কর। অতঃপর জিহাদ কর। সে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে জিহাদে শরীক হয়ে গেল এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেল।

রাসূল (সাঃ) তার ব্যাপারে বললেন যে, লোকটি অল্প আমল করেছে আর অধিক সাওয়াব লাভ করেছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) নেক আমলের ক্ষেত্রে এখানে শুধু ঈমানকে উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমান হতে হবে। ঈমান থাকতে হবে।

আমাদের আলোচনা দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, মুজাহিদরা আমলের বেলায় দুবর্লতা করবে, পাপ থেকে বেঁচে থাকবে না। কারণ, আমলের জন্যই তো মুজাহিদরা এ পথে এসেছে। আমলের উদ্দেশ্যেই তো আল্লাহ্র পথে স্বীয় জান-মাল বাজি রেখে এ পথে এসেছে।

কিন্তু যেমনিভাবে গোনাহগার মুসলমানরা স্বীয় গোনাহকে মোচন করতে নামায, রোযা, হজ্ব-যাকাত, দাওয়াত ও তাবলীগ এবং অন্যান্য নেক আমলের দিকে দৌড়ে আসে, তেমনিভাবে নিজেদের সমূহ পাপ মোচন করানোর জন্য সবচেয়ে বড় ও উত্তম পথ 'জিহাদ' এ কেন আসে না? এ পথেও তাদের আসা দরকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমীরের আনুগত্য

যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমীরের আনুগত্য মেরুদণ্ডের হাড়ের ন্যায়। একজন মুজাহিদের জন্য আমীরের আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। এর ভেতরই রয়েছে তার সফলতা। এটাই তার কামিয়াবীর সোপান। পক্ষান্তরে আমীরের অবাধ্যতা বা কমাণ্ডে না চলা বিফলতাও ধ্বংসের এমন অতল গহ্বর যার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর পুনরায় উঠে আসা মুশকিল ব্যাপার। একজন মুজাহিদ, চাই তিনি ময়দানের কমাণ্ডার হউন বা সাধারণ মুজাহিদ হউন। চাই বড় কোন দায়িত্বশীল হউন চাই ছোট বা বড় কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজ আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে যত্নবান হবেন এবং সর্বাবস্থায় আমীরের ইতাআত করে যাবেন, ততক্ষণ তিনি পদে পদে আসমানী নুসরাত ও যুদ্ধের ময়দানের সফলতা স্বচোক্ষে অবলোকন করবেন সফলতা তার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে থাকবে। কঠিন থেকে কঠিনতর মুহূর্তেও আল্লাহ্ তাকে হিফাযত করবেন। ধীরে ধীরে আল্লাহ্ তাআলা তাকে এমন মাকাম দান করবেন, যার ব্যাপারে কখনো কল্পনাও করেননি। কিন্তু যখন কোন মুজাহিদ আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে অবহেলা শুরু করে। আমীরের নির্দেশ মানতে অলসতা করে। আমীরের অবাধ্য হয়, তখন তার পদস্খলন শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ্র সাহায্য তো দূরের কথা। সামান্য থেকে সামান্য বিষয়েও সে হোঁচট খেতে শুরু করে। নিশ্চিত বিজয় তার হাত ছাড়া হয়ে যায়। সর্বদিক থেকে সে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়ে যায়। আল্লাহ্র নিকট সে নাফরমান সাব্যস্ত হয়। তার অপরাধের কারণে শুধু সে-ই যে, ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাই নয়, বরং তার কারণে পুরো জাতি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তার একার কারণে পুরো কাফেলার প্লান-প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যায়। পুরো দলে

বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। তাই একজন মুজাহিদকে—সে যে কোন পর্যায়ের হোক-সর্বাবস্থায় জীবনবাজি রেখে সর্বাত্মকভাবে আমীরের আনুগত্য করে যেতে হবে। এ ব্যাপারে কোন ধরনের অবহেলা করা যাবে না।

আমীরের আনুগত্য করাই হল রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করা

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع الامير فقد اطاعنى ومن يعصى الامير فقد عصانى وانما الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فان امر بتقوى الله وعدل فان له بذالك اجر وان قال بغيره فان عليه منه

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। আর যে, আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে, আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমারই অবাধ্যতা করল। আমীর হল- ঢাল স্বরূপ, যার আড়ালে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং যার মাধ্যমে রেহাই পাওয়া যায়। আমীর যদি খোদা ভীতির সাথে শরীয়ত সম্মত নির্দেশ করে বা ফয়সালা করে এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে, তবে এর প্রতিদান সে পাবে। আর বিপরীত করলে এর শাস্তিও তার ওপরে বর্তাবে।

(বুখারী) মিশকাত শরীফ পৃঃ-৩১৮

ফায়দা ঃ- হাদীসটি থেকে আমীর বা ইমামের আনুগত্যের গুরুত্ব অনায়াসে বুঝে আসে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা একজন মুমিনের জীবনের মূল টার্গেট। এর ভেতরেই রয়েছে তার সফলতা। পক্ষান্তরে তাদের হুকুম না মানা আত্মঘাতীর শামিল। আর রাসূল (সা.) আমীর বা (ইসলামী) শাসকের আনুগত্যকে নিজের আনুগত্য বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আমীর বা ইমামকে 'ঢাল স্বরূপ' বলার অর্থ হল যে, ঢালের আড়ালে

থেকে যেমনিভাবে শত্রুকে ঘায়েল করা যায়, অনুরূপভাবে ইমাম ও সেনাপতির মদদ ও সাহায্যে শত্রুর মুকাবিলা তথা সকল কাজ কর্মে শক্তি ও সাহস পাওয়া যায়।

আমীর দেখতে বেমানান হলেও তাঁর আনুগত্য করতে হবে

(١) عن ام الحصين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا

১। অর্থ ঃ হযরত উম্মুল হুসাইন (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যদি কোন নাক বা কান কাটা তথা বিকলাঙ্গ ক্রীতদাসকেও তোমাদের শাসক বা আমীর বানিয়ে দেয়া হয় এবং সে তোমাদিগকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করে, তবে তোমরা অবশ্যই তার আদেশ-নিষেধ মেনে চল এবং তার আনুগত্য কর।

(মুসলিম) মিশকাত শরীফ পৃঃ-৩১৯

(٢) وعن انس رضـ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشى كان راسه زبيبة

২। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– তোমরা হুকুম শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর। যদিও তোমাদের ওপর (ছোট ও কাল হওয়ার দিক দিয়ে) কিশমিশ মস্তকি হাবশী গোলামকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। (বুখারী) মিশকাত শরীফ, পৃঃ ৩১৯

ফায়দা ঃ উল্লিখিত হাদীসদ্বয় থেকে এ কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, শাসক বা আমীর দেখতে যে ধরনেরই হোক। চাই তার নাক, কান কাটা হোক। চাই সে বিকলাঙ্গ হোক। চাই তার মাথা ছোট হোক। চাই কুৎসি চেহারাধারী বা বিদঘুটে হোক! চাই সে ক্রীতদাস হোক। যখন সে শরীয়ত সম্মতভাবে শাসক বা আমীর নিযুক্ত হয়েছে, তার আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা কারো বাহ্যিক অবয়ব বা চাক-চিক্যের দিকে তাকান না। আল্লাহ্র নিকট এ সবের কোন মূল্য নেই। আল্লাহর নিকট গ্রহণ যোগ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া।

শরীয়ত বিরোধী কাজে আনুগত্য করা যাবে না

(١) عن ابن عمر رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرأ المسلم فيما احب وكره مالم يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

১। অর্থ ঃ হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির (তাঁর শাসক ও আমীরের নির্দেশ) শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। চাই সেই নির্দেশ তার পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক। যতক্ষণ না তাকে আল্লাহ্র নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তার প্রতি (আল্লাহ্ ও তার রাসূলের) নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়, তখন সেটা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করার দায়িত্ব নেই তো বটেই; বরং তা জায়েযই নেই।

(বুখারী, মুসলিম) মিশকাত শরীফ পৃঃ-৩১৯

(٢) وعن على رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة فى معصية انما الطاعة فى المعروف

২। অর্থ ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন! অন্যায় ও গোনাহের ব্যাপারে আনুগত্য নেই। আনুগত্য শুধু মাত্র ন্যায় ও সৎ কাজের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। (বুখারী, মুসলিম) মিশকাত শরীফ পৃঃ-৩১৯

ব্যাখ্যাঃ বস্তুত এই হাদীসটি দীর্ঘ একটি হাদীসের অংশ বিশেষ। পূর্ণ হাদীসটি এইঃ

একবার রাসূল (সাঃ) একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে কোথাও প্রেরণ করলেন। আর জনৈক আনসারীকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে বাহিনীর লোকদের তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। এক পর্যায়ে কোন এক ব্যাপারে সেনাপতি

তাঁর সৈন্যবাহিনীর ওপর রাগান্বিত হয়ে বললেন, রাসূল (সাঃ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? উত্তরে তারা বললেন ঃ হ্যাঁ।

তখন তিনি বললেন, তাহলে আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা কাঠ সংগ্রহ কর এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করে এতে প্রবেশ কর। কথা মতো তারা কাঠ সংগ্রহ করে তাতে অগ্নি সংযোগ করল এবং আগুনে ঝাপ দেয়ার প্রস্তুতি লগ্নে একে অপরের মুখ পানে তাকালো। ইতিমধ্যে তাদের মধ্য হতে একজন বলে উঠল, যেই আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য স্বীকার করলাম, অবশেষে সেই আগুনে প্রবেশ করেই আমাদের মরতে হবে? তাদের পরস্পরে এ ধরনের বাক্যালাপ চলছিল। ইতিমধ্যে আগুন নিভে গেল। আর সেনাপতির রাগও প্রশমিত হয়ে গেল। অতঃপর কোন এক সময় রাসূল (সা.)-এর নিকট ঘটনাটি উত্থাপন করা হল। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, যদি ঐ লোকগুলো উক্ত আগুনে প্রবেশ করতো, তবে কখনো তারা সেই আগুন থেকে পরিত্রাণ পেতো না। অর্থাৎ চিরকাল জাহান্নামের আগুনে পড়ে থাকতো। সুতরাং জেনে রাখো! আনুগত্য শুধু ন্যায় ও সৎ কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আবু দাউদ পৃঃ ৩৫২ খণ্ড ১

(٣) وعن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق

৩। অর্থ ঃ হযরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রাযিঃ)-বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর মধ্যে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই। মিশকাত শরীফ পৃঃ-৩২০

ব্যাখ্যা ঃ মূলতঃ রাসূল (সা.)-এর এই হাদীসটি একটি নীতিমালা স্বরূপ। যার ব্যাখ্যা হল যে, মাখলুক তথা সৃষ্টি জীবের পক্ষ থেকে যদি এমন কোন কাজের নির্দেশ দেয়া হয়, যা শরীয়ত সম্মত নয়। যার আনুগত্য করতে গেলে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হতে হয়। তবে এ ধরনের নিদের্শের আনুগত্য করা যাবে না। এ নির্দেশ পালন করা যাবে না। এই নীতিমালার ভেতর

শাসক বা আমীরও শামিল। আমীর যদি এমন কাজের নির্দেশ করে, যা শরীয়ত সম্মত, তবে সে নির্দেশ যদি নিজের মনের বিরুদ্ধেও হয়, অথবা তা পালনে কষ্ট হয়, তবুও আমীরের সেই নির্দেশ পালনে স্বচেষ্ট থাকতে হবে। জীবনবাজী রেখে তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে হবে।

আমীর যদি কোন গোনাহে লিপ্ত হয় তবুও তার আনুগত্য করতে হবে

(১) عن عوف ابن مالك الاشجعى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم و يحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم شرار ائمتكم الذين تبغضونهم و يبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يارسول الله افلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما اقاموا فيكم الصلوة لا ما اقاموا فيكم الصلوة الامن ولى عليه وال فراه ياتى شيئا من معصية الله فليكره ما ياتى من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة

১। অর্থ ঃ হযরত আওফ ইবনে মালিক আশজায়ী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের শাসক বা আমীরের মধ্যে সেই আমীররাই উত্তম, যাদের তোমরা ভালবাস আর যারা তোমাদের ভালবাসে। তোমরা তাদের জন্য দোয়া কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দোআ করে। আর তোমাদের সেই আমীররাই মন্দ, যাদের তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে। তাদের প্রতি তোমরা অভিসম্পাৎ কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিসম্পাৎ করে।

বর্ণনাকারী বলেন– তখন আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এমতাবস্থায় আমরা কি সেই সমস্ত আমীরদের অপসারণ করে তাদের সাথে কৃত বাইয়াত ভঙ্গ করে ফেলবো? রাসূল বললেন না, যাবৎ তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করে। (আবার বললেন) না, যাবৎ তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করে। সাবধান! যে ব্যক্তিকে তোমাদের ওপর আমীর নিযুক্ত করা হয়। আর যদি তার মধ্যে আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কোন কিছু

পরিলক্ষিত হয়, তখন তোমরা তার সেই নাফরমানীর কাজটিকে ঘৃণার সাথে অপছন্দ কর। (অর্থাৎ সেই কাজে তার সহযোগিতা করো না) কিন্তু তার আনুগত্য হতে হাত গুটাতে পারবে না । (মোটকথা, আমীরের মধ্যে গোনাহের কোন কাজ দেখা দিলে ও সে আমীর থাকবে। অবশ্য তার অন্যায়ের সাথে সহযোগিতা করা যাবে না। (মুসলিম) মিশকাত শরীফ পৃঃ-৩১৯

(٢) وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى من اميره شيئا يكره فليصبر فانه ليس احد يفارق الجماعة شبرا فيموت الامات ميتة جاهلية

২। অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কেউ তার আমীরকে অপছন্দনীয় কিছু করতে দেখে, তবে তার ধৈর্য ধারণ করা উচিত। কেননা, যে কেহ ইসলামী জামায়াত বা সংগঠন হতে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হল। তবে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।

(বুখারী, মুসলিম) মিশকাত শরীফ পৃঃ-৩১৯

ব্যাখ্যাঃ শাসক বা আমীরের অপছন্দনীয় কাজে বাধা বা প্রতিবাদ করার অনুমতি আছে তাই বলে আনুগত্য ত্যাগ করা মারাত্মক ভুল। একাকী দ্বীন কায়েম করা তো দূরের কথা, রক্ষা করাটাও মুশকিল। সুতরাং জামাআত বা দল হতে বিচ্ছিন্ন থেকে যে মৃত্যু বরণ করল, সে যেন জাহেলিয়াতের ওপরই মরলো।

ফায়েদা ঃ উপরোক্ত হাদীসদ্বয় হতে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আমীর যদি কোন পাপ কাজে লিপ্ত হয়, সে যদি কোন কোন অন্যায় করে। তার মধ্যে যদি কোন আমলী দুর্বলতা থাকে, এমতাবস্থায়ও তার আনুগত্য করতে হবে। তাকে মান্য করতে হবে। এটাকে আড়াল করে নিজেকে আনুগত্য থেকে পিছিয়ে রাখা যাবে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তার পাপ কাজ সমূহে তার আনুগত্য করা যাবে বা তার দোষগুলো সংশোধন যোগ্য নয় বরং

তার পাপ কাজ সমূহে তাঁর আনুগত্য ও সহযোগিতা করা যাবে না এবং তার দোষগুলো সংশোধনের ফিকির করতে হবে। অবশ্যই তা সংশোধন যোগ্য সর্বপরি এটা তার ব্যক্তিগত দোষ। আর কোন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটিকে সামনে রেখে নিজেকে দ্বীনের কাজ থেকে দূরে রাখা যাবে না।

আমীরত্ব বিরাট আমানত

(١) وعن ابى ذر قال قلت يارسول الله الاتستعملنى قال فضرب بيده على منكبى ثم قال يا اباذر انك ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة خزى وندامة الامن اخذها بحقها وادى الذى عليه فيها

১। অর্থ ঃ হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন– আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি আমাকে কোন শাসক বা আমীর নিযুক্ত করবেন না? বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূল আমার কাঁধে করাঘাত করে বললেন, হে আবু যর! তুমি একজন দুর্বল লোক। আর শাসনভার বা আমীরত্ব হচ্ছে একটি আমানত। এর পরিণাম হল-কিয়ামতের দিন অপমান ও লজ্জা। অবশ্য ঐ ব্যক্তির জন্য অপমান ও লজ্জার কারণ হবে না, যে ন্যায়ভাবে তা গ্রহণ করেছে এবং নিষ্ঠার সাথে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে।

(মুসলিম) মিশকাত শরীফ পৃঃ-৩২০

(٢) وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامام الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عن رعيته والمراة راعية على بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده ومسؤل عنه الا فكلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته

২। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল। আর কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সুতরাং জনগণের শাসক বা আমীরও একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কিয়ামতের দিন তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর পুরুষও তার পরিবারের একজন দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রীও তার স্বামীর সংসার ও সন্তানের ওপর দায়িত্বশীলা। কিয়ামতের দিন তাকে ও এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এমন কি কোন ব্যক্তির গোলাম বা দাস (চাকর-চাকরানী)ও তার মনীবের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সে দিন তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করা হবে। অতএব সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই কিয়ামতের দিন এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বুখারী) মিশকাত শরীফ পৃঃ-৩২০

(٣) وعن معقل بن يسار قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مامن وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم الاحرم الله عليه الجنة

৩। অর্থ ঃ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাযিঃ)-হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানদের শাসক বা আমীর নিযুক্ত হয়। অতঃপর সে প্রতারক বা আত্মসাৎকারীরূপে মৃত্যু বরণ করে। আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন। (বুখারী, মুসলিম) মিশকাত শরীফ পৃঃ-৩২১

ফায়দা ঃ উল্লিখিত হাদীস সমূহ থেকে একথাটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শাসনভার বা আমীরত্ব এক বিরাট আমানত। আমীর বা দায়িত্বশীল হওয়া কোন বড় কথা নয় বরং দায়িত্বকে সঠিক ও সুচারুরূপে পালন করাই বড় কথা।

যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কারো আমীর বা দায়িত্বশীল বানিয়েছেন তাদের খুবই সর্তক হতে হবে। সর্বাবস্থায় লক্ষ রাখতে হবে যে, আমার

কথা-বার্তা, চাল-চলন, লেন-দেন ইত্যাদির মাধ্যমে যেন আমার অধীনস্ত লোকদের কোন হক নষ্ট না হয়। নতুবা কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে এর জন্য জবাবদিহী করতে হবে। আর সর্বদা অধীনস্তদের সফলতার ব্যাপারে চিন্তাশীল ও যত্নবান হতে হবে।

আমীরত্ব পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে নেই

(١) وعن ابى موسى قال دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من بنى عمى فقال احدهما يارسول الله امرنا على بعض ما ولاك الله وقال الاخر مثل ذلك فقال انا والله لا نولى على هذاالعمل احدا سأله ولا احدا حرص عليه وفى رواية قال لانستعمل على عملنا من اراده

১। অর্থ ঃ হযরত আবু মুসা (রাযিঃ) বলেন, একদিন আমি ও আমার দু'জন চাচাত ভাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গেলাম। তখন সে দুজনের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যে সকল কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, আপনি আমাদেরকে সে সবের মধ্য হতে কোন একটির দায়িত্বশীল বা আমীর নিযুক্ত করুন। এরপর দ্বিতীয় জনও এরূপ বললো!।

উত্তরে রাসূল বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা একাজে (আমীর বা শাসক পদে) এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করি না, যে তার প্রার্থী হয় এবং ঐ ব্যক্তিকেও না, যে এর জন্য লালায়িত হয়। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রাসূল (সাঃ) বলেনঃ আমরা আমাদের কোন কাজেই এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করি না, যে এর আকাঙ্ক্ষা করে। (বুখারী, মুসলিম) মিশকাত শরীফ পৃঃ-৩২০

(٢) وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لى رسول الله عليه وسلم لاتسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسئلة وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسئلة اعنت عليها

২। অর্থ ঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ করে বলেছেন- হে সামুরা! নেতৃত্ব বা পদ চেয়ো না। কেননা যদি তোমাকে তা চাওয়ার কারণে দেয়া হয়, তবে তা তোমার ওপর সোর্পদ করা হবে। আর যদি তা তোমাকে চাওয়া ব্যতীত অর্পণ করা হয়, তাহলে এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করা হবে।

(বুখারী, মুসলিম) মিশকাত শরীফ পৃঃ-৩২০

ব্যাখ্যাঃ আমীরত্ব, নেতৃত্ব ও দায়িত্বের প্রতি কখনো লালায়িত হওয়া উচিত নয়। বরং এসব থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। তথাপি কোন পদ বা ক্ষমতা যদি আপনা আপনিই এসে যায়, সেখানে প্রবৃত্তির লালসা থাকে না; সুতরাং সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও রহমতের আশা করা যায়। কিন্তু যদি তা হাসিল করার চেষ্টা তদ্‌বীর করা হয়, তখন তা নিঃস্বার্থ হয় না।

সামান্য অবহেলা, বিরাট বিপর্যয়

আমরা এখানে পাঠকদের সামনে এমন দু'একটি ঘটনা তুলে ধরবো, যার মধ্যে আমীরের আনুগত্যের ক্ষেত্রে সামান্যতম অবহেলার কারণে বিরাট বিপর্যয় নেমে এসেছিল।

উহুদ যুদ্ধ! ইসলামের দ্বিতীয় ভয়াবহ যুদ্ধ। মদীনার অনতিদূরে উহুদ পাহাড়। সামানে তার বিশাল প্রান্তর। এ প্রান্তরেই আজ হক ও-বাতিলের পতাকাবাহীরা মুখোমুখি। কাফেরদের সংখ্যা তিন হাজার। উপরন্তু অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ সরঞ্জামে টইটুম্বর। মুসলমানদের সংখ্যা একেবারে নগন্য। মাত্র সাত'শ। তবে নব বলে বিলিয়ান, নব তেজে তেজিয়ান, সত্যের মহান ব্রতে মহিয়ান এই সাতশই যেন সাত হাজার।

সময়মতো যুদ্ধ শুরু হল। উভয় বাহিনীর কোলাহলে উহুদ প্রান্তর মুখর হয়ে উঠলো। সাত'শ সৈন্যের সাত'শ কণ্ঠ এক যোগে হুংকার দিয়ে উঠলোঃ "আল্লাহু আকবার।"

তলোয়ারের ঝনঝনানী আর অশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে মুসলমানরা কাফেরদের পর্যুদস্ত করে ফেলল। মুসলমানরা বিজয় নিশানা উড়িয়ে দিল। আর কাফিররা প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্য

সব ছেড়ে পালাতে শুরু করল। পুরো রণপ্রান্তর মুসলমানদের অনুকূলে এসে গেল। মুসলমানরা গনীমত কুড়াতে লাগলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল তীরান্দায বাহিনীকে একটি সংকীর্ণ পথে দাঁড় করিয়ে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন এবং তাদের সবাই কে লক্ষ করে বললেন ঃ আমরা যুদ্ধে বিজয় লাভ করি কিংবা পরাজয় বরণ করি। কোন অবস্থাতেই তোমরা এ স্থানটি ত্যাগ করবে না।

খানিকক্ষণ তারা রাসূলের এ নিদের্শ পালন করল। কিন্তু জয়ের নেশায় তাদের মন ছিলো ব্যাকুল। মুহূর্তের জন্য তারা রাসূলের নির্দেশকে ভুলে বসল। অন্যান্য সৈন্যদের সাথে এসে গনীমত কুড়াতে শুরু করলো। তাদের আমীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) কঠোরভাবে বাধা দিলেন। কড়া নিষেধ করলেন এবং বললেন যে, রাসূল তাগিদ করে বলেছেন যে, তোমরা এস্থান থেকে নড়বে না। কিন্তু তারা তাঁর কথাকে মানলো না এবং সেই স্থান ত্যাগ করে গনীমত সংগ্রহকারীদের সাথে গিয়ে যোগ দিল। শুধু আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) ও তার সাথে দশজন সৈন্য ঐ স্থানে অটল রইল। বিজয়ের আনন্দে যে পথ ছেড়ে দিয়ে মুসলিম সৈন্য রাসূলের নির্দেশ অমান্য করল, সে পথ ধরেই শত্রু বাহিনী মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) নিজ সাথীদের সাথে শহীদ হলেন। শত্রুরা আরো সামনে অগ্রসর হয়ে পেছন দিক থেকে মুসলিম বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা করলো। মুসলিম বাহিনী তখন হতভম্ব। কিংকর্তব্য বিমূঢ়। প্রতিরোধ গড়ে তোলার আগেই সত্তরজন সাহাবী শহীদ হলেন। রাসূলের চারটি দাঁত ও শাহাদাত বরণ করলো। সাময়িকভাবে কাফিররা বিজয় লাভ করল।

(সহায়তায়, সীরাতুলমুস্তফা-আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (রহ.) খণ্ড-২ পৃষ্ঠঃ ২০৫)

ফায়দাঃ এ যুদ্ধের যিনি সর্বাধিনায়ক ছিলেন তিনি ছিলেন মানব জাতির সর্ব শ্রেষ্ঠ। তাঁর সাথে যারা ছিলেন, তারাও ছিলেন আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় ও মনোনীত ব্যক্তিত্ব। এতদ্বসত্ত্বেও তাঁরা যখন নিজ আমীরের আদেশ মান্য

করতে সামন্যতম অবহেলা করেছে, তখন তারা বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রের পট পরিবর্তন হয়ে গেছে। বিজয় পরাজয়ে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর এ ঘটনার মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতকে সর্তক করে দিয়েছেন। এ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। ইতিহাস সাক্ষী যে, আমীরের আনুগত্যে না করে কেউ সফলকাম হতে পারে নি।

মনে রাখতে হবে, যুদ্ধের ময়দানে একজনের অপরাধের শাস্তি সবাইকে ভোগ করতে হয়। আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন।

মুহাম্মাদ বিন কাসিম আমীরের আনুগত্যে ইতিহাস রচনা করেছেন

ইতিহাসের এক অকুতোভয় বীর সেনানী মুহাম্মাদ বিন কাসিম। যার নাম শুনতেই গর্বে বুক ফুলে উঠে। যিনি মাত্র সতের বছর বয়সে সুদূর আরব থেকে এক মজলূম বোনের আর্তনাদের জবাবে সিন্ধুতে ছুটে এসেছিলেন। রাজা দাহির সহ ইসলাম বিরোধী সকল রাজার সাথে লড়াই করে বিজয় মাল্য ছিনিয়ে নিয়েছেন। ঐ সব এলাকায় ইসলামের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়েছেন।

মুহাম্মাদ বিন কাসিম যখন ইরাক থেকে সিন্ধু আসলেন, তার সাথে মাত্রবার হাজার সৈন্য ছিলো। কিন্তু তার বিজয়াভিযান ও পবিত্র জিহাদের বরকতে মানুষ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হল। এক পর্যায়ে পুরো সিন্ধু ইসলামের ছায়া তলে এসে গেল। মুহাম্মাদ কাসিম যখন সিন্ধু থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন তার সৈন্য সংখ্যা ছিলো ৯০ হাজার। এরা সবাই ছিলো নওমুসলিম, যারা জিহাদ করছিলো। আর জন সাধারণের সংখ্যাতো বলা বাহুল্য। চতুর্দিকে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সুখ্যাতি ছাড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু ইসলামের বর্ণচোরা গোষ্ঠি! আলো যাদের শত্রু। সত্য যাদের পথের কাঁটা। এসব লোক সর্ব যুগ ও সর্ব মহলেই কম বেশ থাকে। মুহাম্মাদ বিন কাসিমের মতো ব্যক্তিত্বও এসব মুনাফিক ও হিংসুকদের হাত থেকে

রক্ষা পাননি। সুলাইমান বিন আবদুল মালিক যখন বাদশাহ হল, হিংসুকরা ষড়যন্ত্র মূলকভাবে তার নিকট মুহাম্মাদ বিন কাসিমের নামে বিভিন্ন অভিযোগ-আপত্তি দাঁড় করিয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে বাদশাহকে ক্ষেপিয়ে তুললো।

সুলাইমান বিন আবদিল মালিক মুহাম্মাদ বিন কাসিমের বিজয় ধারাকে বন্ধ করে দিলো এবং তাকে বরখাস্ত করে গ্রেফতারীর নির্দেশ দিল। নির্দেশ মতো পঞ্চাশ জন সৈন্য গিয়ে হাত কড়া পরিয়ে মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে নিয়ে আসলো। তখন মুহাম্মাদ বিন কাসিমের ৯০ হাজার সৈন্য দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য অবলোকন করছিলো আর রক্তাশ্রু ঝরাচ্ছিলো যে, আমাদের প্রিয় সেনা প্রতির সাথে এ কেমন আচরণ করা হচ্ছে? কিন্তু আমীরের আনুগত্যের দিকে তাকিয়ে মুহাম্মাদ বিন কাসিম সবাইকে কোন ধরনের পদক্ষেপ নিতে বারণ করলেন।

একজন কমাণ্ডার এসে তার নিকট আরয করলো যে, তারা আপনাকে বস্‌রায় নিয়ে জবাই করে দিবে। আপনি তাদের কথা শুনবেন না। আর এলাকার সকল নও মুসলিম আপনার সাথে রয়েছে। সুলাইমানের হুকুমত আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আপনি আপনার হুকুমতের ঘোষণা করুন।

মুহাম্মাদ বিন কাসিম আমীরের আনুগত্যতার এক ঐতিহাসিক বাক্য বলেছেন, যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। তিনি বললেনঃ "আমি আমার মৃতুকে গলায় জড়িয়ে নিতে পারি, কিন্তু আমি এর জন্য প্রস্তুত নই যে, ইতিহাস আমার ব্যাপারে একথা লিখবে যে, মুহাম্মাদ বিন কাসিম মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে।"

অতঃপর যখন তিনি বসরায় গিয়ে পৌঁছলেন, তখন হিংসুকরা কাল বিলম্ব না করে তাকে জবাই করে দিলো।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) সুলাইমান বিন আবদিল মালিকের কাছ থেকে ক্ষমার নির্দেশ নামা লাভ করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে বসরায় আসলেন, তখন দেখলেন যে মানুষ সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিমের জানাযা কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সম্মানিত পাঠক!

এই হৃদয় বিদারক দৃশ্যটির ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারবো না। তবে এটুকু অবশ্যই বলবো যে, ভোগ-বিলাসী ও অযোগ্য বাদশারা সর্বদা দ্বীন ও তৎসঙ্গে ইসলামী হুকুমতকে নিজ হাতে ধ্বংস করেছে। মুসলিম সেনাপতিরা অর্জন করেছে আর বিলাসী শাসকরা ভোগ করেছে।

কবি ইকবালের ভাষায়ঃ

آ میں تجھے بتاؤں کہ تقدیرامم کیاھے
شمشیر وسنان اول طاوس ورباب آخر

আহ্! আমি কী তোমাকে বলবো জাতির ভাগ্যের কথা?
পূর্ববর্তীদের তরবারী বর্শা আর পরবর্তীদের ময়ূর ও বেহালা।

শিক্ষণীয় ঃ মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সাথে যা কিছু করা হয়েছে কয়েক শতক পর্যন্ত এর জন্য হৃদয়বান মুসলমানদের চক্ষু ছিল অশ্রু সিক্ত। তবে এ থেকে মুসলমানদের আমীরের আনুগত্যের এক বিরাট সবক হাসিল হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি গ্রহণ যোগ্য হয়ে যায় এবং তার ব্যক্তিত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, জন সাধারণ তার দিকে ধাবিত হতে শুরু করে তবে এর সুযোগ নিয়ে তাঁকে এমনটি করার অধিকার নেই যে, সে মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর ভরসা করে প্রাণকেন্দ্রে তীর-কামান নিক্ষেপ করতে শুরু করবে। মুহাম্মাদ বিন কাসিম তো শির কাটিয়ে প্রাণ কেন্দ্রকে বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। আর আজ তাঁর অনুসারীরা প্রাণ কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর জন্য গর্দান কাটাতে মরিয়া হয়ে লেগে আছে।

چراغ مردہ کجا نور آفتاب کجا + ببیں تفاوت راہ از کجاست تابکجا

অর্থ ঃ কোথায় জগৎ আলোকিতকারী সূর্যের আলো আর কোথায় কুটির আলোকিতকারী চেরাগের আলো, লক্ষ্য কর দুই রাস্তার মাঝে কতো বিরাট দূরত্ব।

(সহায়তায়- 'সফহায়ে আলমপর নুকূশে জিহাদ' মাওলানা-ফযল মুহাম্মাদ, পাকিস্তান পৃষ্ঠাঃ ৯৫)

একজন আমীর বা জিম্মাদারের অত্যবশ্যকীয় দিক সমূহ

* শরীয়তের আলেম হওয়া।
* নিজ শু'বা বা বিভাগের শরঈ বিধি-বিধান সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত হওয়া।
* নির্ধারিত শু'বা'র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ জ্ঞান ও বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা।

* শরীয়তের ওপর পূর্ণ আমলকারী হওয়া। বিশেষ করে সুন্নাত বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত না থাকা।

* আক্বীদা-বিশ্বাস, শিক্ষা-দীক্ষা ও মন-মানসে কোন ধরনের বাতিলের প্রভাব না থাকা।

* তাকওয়া-খোদাভীতি থাকা।

* ইনসাফ ও ন্যায় পরায়ণতা থাকা।

* বিচক্ষণতা থাকা।

* ত্যাগ দেয়ার যোগ্যতা ও মানসিকতা থাকা।

* ঈসার তথা নিজের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার মানসিকতা থাকা।

* বিনয়ী হওয়া।

* পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দতা বজায় রাখার মানসিকতা থাকা।

* দায়িত্ববোধ থাকা।

* মুহাসাবা– আত্মসমালোচনায় বিশ্বাসী হওয়া।

* মশওয়ারা-পরামর্শের সুন্নাত পালনের প্রতি যত্নবান হওয়া।

* সহকর্মীদের মূল্যায়নে সার্বিক আগ্রহ প্রকাশের ভাবাপন্ন হওয়া।

* অধীনস্তদের মানসিক অবস্থা ও সমস্যার প্রতি খিয়াল রাখার প্রতি গুরুত্বশীল হওয়া।

* সময় মতো কঠোরতা দেখানোর সাহস থাকা।

* হক প্রকাশে সৎ সাহসী হওয়া।

* আর্থিক ভাবে নিজে স্বাবলম্বী হওয়া (হলে ভাল)।

* মিথ্যা ও অবাস্তব কথা বলা বা এর আশ্বাস দেয়ার অভ্যাস না থাকা।

* কথা-কাজে সমন্নয় রক্ষায় পরিপূর্ণ সচেতন থাকা।

* কোন বিষয়ে কথা বলতে বুদ্ধি-বিবেক ও বিবেচনার পরিচায়ক হওয়া।

* আন্দায বা অনুমান করে কোন কথা বা কাজ না করায় অভ্যস্ত হওয়া।

* কাউকে নির্দেশ দিতে স্থান, কাল ও পাত্রের ভেদাভেদ বুঝতে পারা।

* অধীনস্তদেরকে নিজের দাস সমমানে তাদের সাথে দাস সূলভ আচরণ প্রর্দশন না করা।

* নেতৃত্বের জন্য সুদৃঢ় নৈতিক, চারিত্রিক প্রশিক্ষণ ও পূর্ণাঙ্গ আত্মীক পরিশুদ্ধি অর্জন করা।

(সহায়তায়-মুসলমানদের পতনে-মুসলিম বিশ্ব কী হারালো? আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)

কোন জিম্মাদার বা দায়িত্বশীল বানানোর ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা অপরিহার্য।

সমাপ্ত

শরীয়তের দৃষ্টিতে

আমীর নির্ধারণ

ও

তার আনুগত্যের গুরুত্ব

মাওলানা ঃ মুহাম্মাদ ওমর ফারুক

প্রকাশক ঃ

মাকতাবাতু সাইয়্যেদিশ শুহাদা

প্রকাশকাল

জুলাই ২০০৫ ইং

মূল্য ঃ বিশ টাকা মাত্র

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছো না। দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপথ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী ! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।

(সূরা- নিসা, আয়াত-৭৫)

রাসূল (স.) ইরশাদ করেনঃ

যখন তোমরা জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হবে, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের দ্বীন তথা জিহাদের দিকে ফিরে না আসবে।

(কানযুল উম্মাল)

মাকতাবাতু সাইয়্যিদিশ শুহাদা
ঢাকা, বাংলাদেশ